আন্তর্জাতিক খিলাফত কনফারেন্স

রাষ্ট্র সংস্কার নাকি রাষ্ট্রের সামগ্রিক পরিবর্তন?

(কনফারেন্সে উপস্থাপিত বক্তব্য হতে সংকলিত)

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্‌ বাংলাদেশ

সূচীপত্র

০১. ভূমিকা পৃষ্ঠা ০৩

০২. বক্তব্য-১: নতুন বাংলাদেশ - নেতৃত্বশীল রাষ্ট্রের রূপরেখা পৃষ্ঠা ০৪

০৩. বক্তব্য-২: দেশে দেশে কেন বিপ্লব পরবর্তী সংস্কার ব্যর্থ হয়েছে পৃষ্ঠা ১১

০৪. বক্তব্য-৩: পশ্চিমা বিশ্বে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দেউলিয়াত্ব পৃষ্ঠা ১৭

০৫. বক্তব্য-৪: রাষ্ট্রের সামগ্রিক পরিবর্তন দ্রুত বাস্তবায়নের রোডম্যাপ পৃষ্ঠা ২৩

০৬. উপসংহার পৃষ্ঠা ২৭

২৯ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

২৭ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরী

বক্তব্যসমূহের ভিডিও লিংক:

https://tinyurl.com/y9dma9fu

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রহিম

ভূমিকা:

দীর্ঘ ১৫-বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং সর্বশেষ জুলাই এর ছাত্র-জনতার তীব্র গণ-আন্দোলনের মুখে যালিম হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে। পতিত হাসিনার মত ফ্যাসিস্ট সরকার যেন আর ফেরত না আশে এবং নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ড. ইউনুসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য ছয়টি কমিশন, যেমন: সংবিধান সংস্কার, বিচার ব্যবস্থা সংস্কার, জনপ্রশাসন সংস্কার, পুলিশ সংস্কার, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার ও নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। অনেকে গণমাধ্যম, চিকিৎসা এবং শিক্ষা ব্যবস্থাও সংস্কার দাবী করেছেন। অন্যদিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের হাতে নেয়া ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচীতে দেশের অন্যতম ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল বিএনপি দুঃচিন্তায় আছে। কারণ, হাসিনা সরকার পতনের পর বিএনপিগোষ্ঠীর ক্ষমতায় যাওয়ার যে সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়েছে, 'মাইনাস-টু' ফর্মুলার মাধ্যমে তারা সে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছে। তাই তারা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার করে দ্রুত নির্বাচন দাবী করছে। সংস্কার নিয়ে বিএনপির মতামত হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংস্কারের বৈধ কর্তৃপক্ষ হচ্ছে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের। বিএনপিগোষ্ঠীর প্রতিউত্তরে ইউনুস সরকার দাবী করছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হচ্ছে তরুণদের বিপ্লবের ফল; তাই তরুণদের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে রাষ্ট্রের আমূল সংস্কার দরকার। এ প্রসঙ্গে তারা 'রিসেট বাটন' পুশ করে অতীত ভুলে যেতে বলেছে।

মূলতঃ রিসেট বাটন পুশ করলে বিদ্যমান অপারেটিং সিস্টেম পরিবর্তন হয়না, বরং সাময়িকভাবে পুরাতন জাঙ্ক বা আবর্জনা দূর হয় এবং পরবর্তীতে আবারও আবর্জনা তৈরি হয়। বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ঠিক রেখেই তারা যেই সংস্কারের কথা বলছে, এতে রাষ্ট্রের আমূল বা সামগ্রিক পরিবর্তন হয়না, এবং তাই জনগণের ভাগ্যেরও পরিবর্তন হয়না। তাছাড়া, রাষ্ট্র সংস্কার কর্মসুচিতে জনগণের তেমন কোন উৎসাহও দেখা যাচ্ছে না, কারণ জনগণ এসব সংস্কারে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন প্রতিফলন দেখছে না। তাই, যালিম হাসিনার পতনের দাবীতে জনগণের মধ্যে যে নজিরবিহীন ঐক্য দেখা গিয়েছিল, বর্তমান সংস্কার কার্যক্রমে জনগণের মধ্যে সেই রকম ঐক্য আর দেখা যাচ্ছে না।

এই প্রেক্ষাপটে, **হিযবুত তাহ্‌রীর**, উলাই'য়াহ্‌ বাংলাদেশ **"রাষ্ট্র সংস্কার নাকি রাষ্ট্রের সামগ্রিক পরিবর্তন"** শীর্ষক এই আন্তর্জাতিক খিলাফত কনফারেন্সের আয়োজন করে। কনফারেন্সের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান বাস্তবতায় দেশের জনগণকে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা যাতে জনগণ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে করণীয় ঠিক করতে পারে এবং কাঙ্ক্ষিত নতুন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে যা আছে তা পরিবর্তন করে"** [সূরা আর-রাদ : ১১]।

আন্তর্জাতিক এই খিলাফত কনফারেন্সটিকে চারটি বক্তব্য দ্বারা সাজানো হয়।

প্রথম বক্তব্য: **"নতুন বাংলাদেশঃ নেতৃত্বশীল রাষ্ট্রের রূপরেখা"**, উপস্থাপন করেন জনাব কাজী তন্ময়; সদস্য, **হিযবুত তাহ্‌রীর**।

দ্বিতীয় বক্তব্য: **"দেশে দেশে কেন বিপ্লব পরবর্তী সংস্কার ব্যর্থ হয়েছে"**, লেবানন থেকে বক্তব্যটি উপস্থাপন করেন জনাব আহমেদ আল কাসাস; প্রধান মুখপাত্র, সেন্ট্রাল মিডিয়া অফিস, **হিযবুত তাহ্‌রীর**।

তৃতীয় বক্তব্য: **"পশ্চিমা বিশ্বে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দেউলিয়াত্ব"** অস্ট্রেলিয়া থেকে এই বক্তব্য উপস্থাপন করেন জনাব ওয়াসিম দউরি; সদস্য, **হিযবুত তাহ্‌রীর**।

চতুর্থ বক্তব্য: **"রাষ্ট্রের সামগ্রিক পরিবর্তন দ্রুত বাস্তবায়নের রোডম্যাপ"** উপস্থাপন করেন জনাব আবু সাঈদ; সদস্য, **হিযবুত তাহ্‌রীর**।

বক্তব্য ০১: নতুন বাংলাদেশঃ নেতৃত্বশীল রাষ্ট্রের রূপরেখা

প্রিয় দেশবাসী, কেমন বাংলাদেশ চাই এই আলোচনা এখন সর্বত্র, নতুন বাংলাদেশ নিয়ে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। চাকুরীতে কোটা সংস্কার আন্দোলনের ফসল হিসেবে গঠিত বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা তরুণদের বলছেন, তার দৃষ্টিতে চাকুরী হচ্ছে আধুনিক দাসত্ব। বেকারত্ব নিয়ে যখন দেশের ৪২ শতাংশ তরুণ উদ্বিগ্ন (প্রথম আলো, ০৭ নভেম্বর ২০২৪), সেখানে তিনি তরুণদের চাকুরীর পিছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এছাড়া তিনি ব্যবসাবান্ধব নীতি গ্রহণ না করে দেশকে উচ্চ মধ্য-আয়ের দেশে উন্নীত করতে ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই আকাঙ্ক্ষাগুলো বাস্তবায়নে তিনি কি কোন বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ উপস্থাপন করেছেন? অপরদিকে, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলসমূহের প্রত্যাশা হচ্ছে, বাংলাদেশ হবে একটি উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেন তাদের ক্ষমতায় আরোহণের পথ সুগম হয়। অথচ তাদের কেউ কি প্রশ্ন করেছে জনগণের প্রত্যাশা কি, জনগণ কি চায়?

প্রকৃতপক্ষে, জনগণ চায় স্বচ্ছল জীবন, তার ন্যায্য অধিকার ও নিরাপত্তা, এবং আইন-আদালতে ন্যায়বিচার। তরুণরা কর্মসংস্থান ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ চায়। শ্রমিকরা তার ন্যায্য মজুরী চায়। সচেতন জনগণ প্রত্যাশা করে শাসকগোষ্ঠী মার্কিন-বৃটেন-ভারতের দালালী করবে না এবং তারা চায় বিদেশী শক্তির আগ্রাসন ও আধিপত্য মুক্ত সার্বভৌম রাষ্ট্র। সর্বোপরী, এদেশের ইসলামপ্রিয়

বৃহত্তর জনগণ ইসলাম মোতাবেক তাদের জীবনযাপন করতে চায়। এবং তারা এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চায় যেখানে তাদের সন্তানরা পশ্চিমা অশ্লীল মূল্যবোধের পরিবর্তে ইসলামী মূল্যবোধ অর্জন করতে পারবে। জনগণের এসব দাবীসমূহ তাদের বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে প্রতিফলিত হয়েছে।

বিগত পাঁচ দশকে বাংলাদেশে বিভিন্ন গণঅভ্যুত্থান হয়েছে, বর্তমান সংবিধান সতেরবার সংস্কার করা হয়েছে, দেশে কসমেটিক উন্নয়ন হয়েছে, কিন্তু জনগণের এসব আকাঙ্ক্ষার কোনটাই পূরণ হয় নাই। এর মূল কারণ, শাসকগোষ্ঠীর চেহারার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রের সামগ্রিক পরিবর্তন হয় নাই, বরং রাষ্ট্র পশ্চিমাদের পঁচে যাওয়া ব্যর্থ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এই ব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা জনগণকে উপেক্ষা করে শাসকশ্রেণী ও তার সহযোগী, কতিপয় পুঁজিপতি ও পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের স্বার্থরক্ষা করে। তাই রাষ্ট্রের সামগ্রিক পরিবর্তন করে একটি নেতৃত্বশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব।

এই পর্যায়ে, আমরা **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর পক্ষ থেকে আজকের এই কনফারেন্সে **'নেতৃত্বশীল নতুন বাংলাদেশের রূপরেখা'** উপস্থাপন করছি। ইসলামী বিশ্বাস ও শাসন ব্যবস্থার আলোকে এই রূপরেখা প্রস্তুত করা হয়েছে যার মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র জনগণের দাবীসমূহ পূরণ হবে এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিফলন ঘটবে।

একটি নেতৃত্বশীল রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি?

- প্রথমতঃ রাষ্ট্রকে এমন একটি সুনির্দিষ্ট ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে যার প্রতি জনগণের ঐক্যমত আছে। এই ভিত্তি বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা এবং আবেগ-অনুভূতির সাথে সামঞ্জস্য হতে হবে।
- দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশকে অবশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ বা আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্র হতে হবে। কারণ পরনির্ভরশীল রাষ্ট্র কখনও নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারে না এবং এই রাষ্ট্রের উপর বহিঃশক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
- তৃতীয়তঃ বাংলাদেশকে হতে হবে মার্কিন-বৃটেন-ভারতসহ উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রের আধিপত্যমুক্ত সার্বভৌম ও শক্তিশালী রাষ্ট্র। তাই, বাংলাদেশকে সামরিকভাবে এমন শক্তিশালী হতে হবে যেন তা বহিঃশক্তির আগ্রাসন মোকাবেলায় সক্ষম হয় এবং বিশ্বে নিজের স্বার্থকে কেন্দ্র করে তার পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন করতে পারে।

বাংলাদেশের জনগণের ঐক্য ও রাষ্ট্রের ভিত্তি:

প্রিয় দেশবাসী, আপনারা জানেন গত পাঁচ দশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বাঙালী জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদসহ নানাভাবে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এসব ভিত্তি জনগণের মধ্যে ঐক্যতো দূরের কথা বরং জনগণের মধ্যে বিভক্তিকে আরও প্রকট করেছে। যালিম হাসিনাকে অপসারণের জন্য জনগণের মধ্যে যে নজিরবিহীন জাতীয় ঐক্য তৈরি হয়েছিল, হাসিনা পরবর্তী নতুন বাংলাদেশ বিনির্মানে কেন সেই ঐক্য ধরে রাখা যায় নাই অনেকের মধ্যে এটা একটি বড় প্রশ্ন। প্রিয় দেশবাসী, নতুন বাংলাদেশ বিনির্মানে জাতীয় ঐক্য প্রয়োজন এই বিষয়টি সবাই উপলব্ধি করতে পারছে:

- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, "সংস্কারের জন্য জাতীয় ঐক্য প্রয়োজন।" তিনি 'রিসেট বাটন পুশ' করে অতীত ভুলে গিয়ে নতুন করে চিন্তা করার কথা বলেছেন। জনগণ তিক্ত অতীত ভুলে যেতে চাচ্ছে কিন্তু তারপর কীসের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য তৈরি হবে তা জনগণের নিকট স্পষ্ট নয়।
- সম্প্রতি বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতারা চব্বিশের জুলাই বিপ্লব ও গণঅভ্যুত্থানের চেতনার ভিত্তিতে 'প্রক্লেমেশান অব রিপাবলিক' ঘোষণার দাবী জানিয়েছে এবং গণতন্ত্রমনা রাজনৈতিক দলসমূহকে এই চেতনার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। তারা নিজেদেরকে তরুণদের প্রতিনিধি দাবী করে, অথচ দেশব্যাপী খ্যাতিমান স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ইসলামী শাসনের যে দাবী তুলেছে এবং কলেমার পতাকা হাতে নিয়ে যে ইসলামী চেতনাকে প্রদর্শন করেছে, তারা কি সেই ইসলামী চেতনাকে ধারণ করেছে?
- বিএনপিগোষ্ঠী তাদের রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১-দফার রূপকল্পে "রেইনবো নেশন" দর্শন উপস্থাপন করেছে এবং রাজনৈতিক বন্দোবস্তের জন্য জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব করেছে। অথচ অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের নামে পশ্চিমাদের "রেইনবো নেশন" ধারনা এদেশের বৃহত্তর জনগণের ইসলামী মুল্যবোধের বিরুদ্ধে।
- তাদের এসব প্রস্তাব ও আহ্বান ব্যাপক আলোচিত-সমালোচিত হলেও এসবের মধ্যে জনগণের দাবী-দাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন নাই। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলসমূহ পশ্চিমাদের আদলে জনগণের মধ্যে ঐক্য তৈরি করাতো দূরের কথা, তারা জনগণকে আশ্বস্তও করতে পারছে না।

প্রিয় দেশবাসী, বাংলাদেশের জনগণের ৯০% হচ্ছে মুসলিম এবং তারা ইসলামপ্রিয়। ইসলাম এদেশের বৃহত্তর জনগণের মৌলিক বিশ্বাস এবং জনগণের আবেগ-অনুভূতির সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলাম আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"আর আপনি (হে মুহাম্মদ) আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী শাসন (বিচার-ফয়সালা) করুন এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না"** [সূরা আল-মায়িদা : ৪৯]। তাই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে ইসলাম, যার ভিত্তিতেই জনগণ ঐক্যবদ্ধ হবে। ইসলাম ছাড়া অন্যকোন জীবনাদর্শ এদেশের জনগণের মৌলিক বিশ্বাস, আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী। তাই, বিভিন্ন সময়ে শাসকগোষ্ঠী ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানে 'রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম' অথবা 'বিসমিল্লাহ্' সংযোজন করে জনগণের সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করেছে।

কেউ কেউ "ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার" এই মন্ত্র দিয়ে ইসলামী ব্যবস্থা অমুসলিমদের জন্য উপযুক্ত নয় বলে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে রাষ্ট্রের ভিত্তি বানানোকে অপরিহার্য দেখাতে চায়। অথচ ইসলাম মহান সৃষ্টিকর্তা মনোনীত পূর্ণাঙ্গ শাসনব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমস্যাগুলো যেমন, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষা-নিরাপত্তা, উন্নত জীবনমান (high living standard), ইত্যাদিকে মানবীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং কার্যকরভাবে সমাধান করে। আর অমুসলিমদের পারিবারিক বিষয়াদি যেমন, বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরসূরীর মধ্যে সম্পদ বন্টনসহ ধর্মীয় বিষয়সমূহ ফায়সালা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ধর্মের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী ফায়সালা

করার ব্যবস্থা করে। এই বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, মুসলিম ও অমুসলিমগণ ইসলামী ব্যবস্থার অধীনে সুখ ও সমৃদ্ধির সাথে জীবনযাপন করেছিল। এই বিষয়ে **হিযবুত তাহ্‌রীর** কুর'আন-সুন্নাহ্‌'র ভিত্তিতে প্রণীত ও বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ **"খিলাফত রাষ্ট্রের সংবিধান (খসড়া)"** ইতিমধ্যে জনগণের নিকট উপস্থাপন করেছে। সর্বোপরী, জনগণও এই ইসলামী সংবিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় ঐক্যবদ্ধ।

স্বয়ংসম্পূর্ণ (Self-Sufficient) রাষ্ট্র গঠন:

বাংলাদেশকে নেতৃত্বশীল রাষ্ট্র হতে হলে অবশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ বা আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। কারণ পরনির্ভরশীল রাষ্ট্র কখনও নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারে না এবং এই রাষ্ট্র বহিঃশক্তির আধিপত্যের কবলে পতিত হয়। বাংলাদেশে উর্বর ভূমি, অফুরন্ত জ্বালানী সম্পদ, ব্যাপক কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী এবং কৌশলগত ভূমি ও নদী-নালা ও সামুদ্রিক অবস্থান থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ আমদানীনির্ভর, ঋণনির্ভর এবং পরনির্ভরশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। অব্যাহত রিজার্ভ সংকট একটি দেশের দেউলিয়াগ্রস্থ অর্থনীতিকে নির্দেশ করে। এর অন্যতম কারণ দেশের অর্থনীতিতে নব্য-উপনিবেশবাদী প্রতিষ্ঠান আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক এর পুঁজিবাদী নীতি বাস্তবায়ন। আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক এর ঋণের শর্তানুসারে বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে উৎপাদন বন্টন চুক্তি (PSC) এবং ১৯৮০ সালে কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি (SAPs) গ্রহণ করা হয়। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক এর ঋণের ফাঁদে পড়ে আফ্রিকার দেশসমূহ দারিদ্রতম দেশে পরিণত হয়েছে। যেই সুদানকে বলা হতো আরব বিশ্বের 'Food Basket', সেই সুদান আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক এর নীতি অনুসরণ করে বিশ্বের অন্যতম দুর্ভিক্ষপ্রবণ দেশে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোন নজির নাই যেখানে কোন দেশ আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক এর নীতি অনুসরণ করে আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তাই নতুন বাংলাদেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক এর নীতিসমূহ উচ্ছেদ করে ইসলামী অর্থনৈতিক মডেল বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রিয় দেশবাসী,

- রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: *"বাস করার জন্য একটি গৃহ, আব্রু রক্ষার জন্য এক টুকরা কাপড়, আর খাওয়ার জন্য এক টুকরা রুটি ও একটু পানি এসবের চেয়ে অধিকতর জরুরী কোন অধিকার আদম সন্তানের থাকতে পারে না।"* (তিরমিযী)। এই হাদিস জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার শারী'আহ্ বাধ্যবাধকতাকে নির্দেশ করে।

- জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য কৃষি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অথচ আমাদেরকে পরনির্ভরশীল করতে আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান নিষিদ্ধ করেছে। আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্র কৃষিতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে বিপ্লব নিয়ে আসবে এবং জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। কৃষকদের বিনামূল্যে উন্নত বীজ, সার ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ করবে এবং বিনাসুদে ঋণ প্রদান করবে; আর কৃষকরা শুধু শ্রম দিবে। এই ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC) এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে কার্যকর ভূমিকা পালনে গতিশীল করা হবে।

- যেহেতু দেশের ৮০% জনগোষ্ঠী জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল, কৃষিতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত হবে এবং নিত্য

প্রয়োজনীয় পন্যের দাম সাধারণ মানুষের নাগালে চলে আসবে।

- চিনি-পাট-রেশম-চামড়া শিল্প আমদের দেশের খুবই সম্ভাবনাময় শিল্প। এসব শিল্পের মাধ্যমে আমরা ব্যাপক কর্মসংস্থান এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারি। দালাল শাসকগোষ্ঠী আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে পাটশিল্প বন্ধ করে দেয় এবং চিনি শিল্প বন্ধের পর্যায়ে রয়েছে। আপনারা জেনে অবাক হবেন, আমাদের পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় পলিথিনের বিকল্প পরিবেশ বান্ধব পাটজাত ব্যাগ উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই শিল্প আলোর মুখ দেখছে না। আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্র এসব শিল্পকে পুনঃরুদ্ধার করবে, প্রয়োজনে প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ (PPP)-এর আওতায় নিয়ে এসে এই শিল্পকে গতিশীল করবে। ফলে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে রাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে।

- মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিদেশী বিনিয়োগের (FDI)-এর কারণে বিদেশী পন্য দেশের বাজার দখল করে আছে ও দেশ বহুজাতিক কোম্পানীর হটস্পটে পরিণত হয়েছে। ইপিজেড এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে এই বহুজাতিক কোম্পানীসমূহ নিরবিচ্ছিন্ন জ্বালানী ও বিশেষ কর সুবিধা পাচ্ছে। আর অন্যদিকে নিজস্ব শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় কোন উদ্যোগ নাই, যেমন নিজস্ব শিল্পায়নে চীনের নীতি রয়েছে। দেশে গার্মেন্টসের মত লো-প্রোফাইল শিল্প ছাড়া কোন ভারী প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের অস্তিত্ব নাই।

- অর্থনীতিতে বিদেশী কোম্পানীর এই আধিপত্য শারী'আহ্'র দৃষ্টিতে হারাম। আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্র বিদেশী সরাসরি বিনিয়োগ (FDI) নিষিদ্ধ করবে এবং বেসরকারী খাতে নিজস্ব শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে শিল্পনীতি প্রণয়ন করবে। এর মাধ্যমে দেশে দ্রুত শিল্পায়ন হবে এবং তরুণদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে।

- আপনারা জানেন, আমাদের দেশ অফুরন্ত জ্বালানী ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। অথচ দেশের জ্বালানী সম্পদ (তেল-গ্যাস) উৎপাদন-বন্টন চুক্তি (PSC)-এর আওতায় বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীর দখলে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানী শেভরন (Chevron) একাই দেশের গ্যাসক্ষেত্র থেকে উত্তোলন করা গ্যাসের ৬০ শতাংশ সরবরাহ করছে, আরেকটি মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানী ExxonMobil গভীর সমুদ্রের ১৫ টি ব্লকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের ইজারার জন্য অপেক্ষা করছে।

- বিদেশীদের স্বার্থে আমাদের পেট্রোবাংলা ও বাপেক্সকে দুর্বল করে রাখা হয়েছে। ExxonMobil গভীর সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে ৩০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার প্রস্তাব দিয়েছে। অথচ দুর্নীতিগ্রস্থ শাসকগোষ্ঠী প্রতিবছর ১২ বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার করেছে। আমরা যদি ৩ বছর এই পাচার রোধ করতে পারতাম তাহলে সে অর্থ দিয়ে আমরা নিজেরাই গভীর সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান করতে পারতাম।

- শারী'আহ্ আইন অনুযায়ী এই সম্পদগুলো হচ্ছে জনগণের সম্পদ (গণমালিকানাধীন সম্পদ) যা ইজারা দেয়া বা বেসরকারীকরণ হারাম। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "*মুসলিমরা (জনগণ) পানি, চারণভূমি এবং*

আগুন-এই তিনটি জিনিসের অংশীদার" (আবু দাউদ)।

- আসন্ন খিলাফত তেল-গ্যাস-কয়লাসহ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ থেকে উপনিবেশবাদী কোম্পানীসমূহকে উচ্ছেদ করে পেট্রোবাংলা ও বাপেক্স এর ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসবে, এবং তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে বাপেক্সকে সক্ষম ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলবে।

- এছাড়া বিদ্যুৎখাতও শারী'আহ্ দৃষ্টিতে গণমালিকানাধীন সম্পদ। তাই আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্র বিদ্যুৎখাত থেকে কুইক রেন্টাল প্রকল্পের নামে দেশী-বিদেশী কোম্পানীসমূহকে (আদানিগ্রুপ, সামিটগ্রুপ) উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসবে এবং সুলভ মূল্যে জনগণের মধ্যে বন্টন করবে, এবং কল-কারখানায় সরবরাহ করবে। এসব গণমালিকানাধীন সম্পদ থেকে যে রাজস্ব পাওয়া যাবে তা দিয়ে জনগণের জন্য ব্রিজ-কালভার্ট সহ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। ফলে এই খাতে বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভরশীলতার অবসান হবে।

- বর্তমানে দেশে উপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা বিদ্যমান, যার মাধ্যমে সর্বোচ্চ বহুজাতিক কর্পোরেট দাস এবং আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের কর্মচারী তৈরি হয়। আসন্ন নেতৃত্বশীল রাষ্ট্রের ব্লু-প্রিন্ট বাস্তবায়নে ভিশনারি ও বিশ্বমানের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হবে। সর্বোপরি, ইসলামী অর্থনীতির মডেলের যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমরা আপনাদের নিকট উপস্থাপন করলাম, এর কয়েকটি বাস্তবায়ন করলে আমরা শুধুমাত্র স্বনির্ভর হবো তা নয় বরং নেতৃত্বশীল অর্থনীতিতে পরিণত হবো, ইনশা'আল্লাহ্।

নেতৃত্বশীল পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতি:

- বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠীর ধারাবাহিক পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে, পশ্চিমাদের বিশেষ করে মার্কিন-বৃটেনের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করা এবং তাদের আঞ্চলিক চৌকিদার ভারতকে শক্তিশালী করা। শাসকগোষ্ঠী অত্র অঞ্চলে চীনকে প্রতিহত করার মার্কিন ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন সামরিক ও কৌশলগত চুক্তি করেছে।

- শাসকগোষ্ঠী আমাদের সামরিক বাহিনীকে মুসলিম উম্মাহ্'র সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ব্যবহার করছে না, যেমন ফিলিস্তিনের মুসলিম ভাই-বোনদের উপর চলমান অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের গণহত্যা বন্ধ করতে তাদেরকে প্রেরণ করছে না, বরং তাদেরকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের নামে পশ্চিমাদের উপনিবেশবাদ রক্ষার জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"হে মু'মিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর বন্ধু; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত"** [সূরা আল-মায়িদা : ৫১]।

হে দেশবাসী!

ইসলামের পররাষ্ট্র নীতি হচ্ছে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহ্'র স্বার্থ রক্ষা করা এবং ইসলামের আদর্শকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন"** [সূরা আত-তাওবা : ৩৩]। আমরা যদি দেশের উপর বহিঃশক্তির আগ্রাসন মোকাবেলা করতে এবং বিশ্ব পরিমন্ডলে সার্বভৌম পররাষ্ট্র নীতি বাস্তবায়ন

করে চাই তাহলে আমাদেরকে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এটি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের উপর ফরয করেছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহ্'র শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন"** [সূরা আনফাল : ৬০]।

- খিলাফত রাষ্ট্রের শিল্পনীতি হবে প্রতিরক্ষাকেন্দ্রিক ভারী শিল্প স্থাপন, যেন আমাদের সামরিক বাহিনীকে উন্নত ও আধুনিক সরঞ্জামে সুসজ্জিত করা যায়।
- জিহাদ হচ্ছে প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য একটি ফরজ দায়িত্ব। তাই আমাদের নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি বাধ্যতামূলক রিজার্ভ ফোর্স থাকতে হবে। সেই লক্ষ্যে আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্র পনেরো বছর বয়স্ক বা তদূর্ধ প্রতিটি মুসলিম পুরুষকে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এক সুবিশাল সিটিজেন আর্মি গড়ে তুলবে। এছাড়া, দেশের আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রায় ৭০ লক্ষ সদস্য কর্মরত আছে যারা তাদের বিশ্রাম ব্যবস্থা বাতিল ও চাকুরী জাতীয়করণের দাবী জানিয়েছে। অনতিবিলম্বে এই বাহিনীকে জাতীয়করণ করে সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধা-সামরিক বাহিনীতে উন্নীত করার সুযোগ রয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

নতুন বাংলাদেশকে একটি নেতৃত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার যে ব্লু-প্রিন্ট আমরা উপস্থাপন করলাম তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে এবং তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে, ইনশা'আল্লাহ্। আমরা ইসলামের ভিত্তিতে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হবো, ইসলামী সংবিধান দিয়ে জীবনযাপন করতে পারবো, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনগণ মৌলিক চাহিদা পূরণ ও স্বচ্ছল জীবনযাপন করতে পারবে, তরুণদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যাত্রা শুরু হবে; সর্বোপরী, আমরা একটি সার্বভৌম, শক্তিশালী ও নেতৃত্বশীল রাষ্ট্রে পরিণত হবো।

নতুন বাংলাদেশ যখন ইসলামী শাসনের অধীনে নেতৃত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হবে, তখন অত্র অঞ্চলে ভারতের আধিপত্যের অবসান হবে এবং অত্র অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"আর এভাবেই আমরা তোমাদেরকে ন্যায়পরায়ণ উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন"** [সূরা আল-বাকারা : ১৪৩]।

বক্তব্য উপস্থাপন করেন - জনাব কাজী তন্ময়
সদস্য, **হিযবুত তাহ্রীর**

বক্তব্য ০২: আরব দেশগুলোর বিপ্লবগুলো কেন পরিবর্তন আনতে পারেনি? (অনুবাদকৃত)

প্রায় চৌদ্দ বছর আগে, তিউনিসিয়ায় একটি বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে, এবং তা দ্রুত, কয়েক দিনের মধ্যে, অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। মিশর, এরপর লিবিয়ায়, অতঃপর সিরিয়া ও ইয়েমেনসহ বিপ্লবের প্রভাব পড়েনি এমন আরব দেশ খুব কমই ছিল, যদিও এক দেশ থেকে অন্য দেশে এই প্রভাবের মাত্রা ছিল ভিন্ন। এই বিপ্লবগুলো ছিল মুসলিম উম্মাহ্'র জন্য বিশেষ করে দলীয় পরিচয় ও মত-পথ নির্বিশেষে সকল দাওয়াহ্ বহনকারীদের জন্য আশা ও আকাঙ্খার এক উৎস, যারা পরিবর্তনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। অত্যাচারী-অপরাধী শাসকগোষ্ঠীর নৃশংসতা ও বর্বরতার প্রতি মানুষের যে ভীতি ছিল, এই বিপ্লবগুলো তা ভেঙে দিয়েছিল, এবং কয়েক দশক ধরে উম্মাহ্ যে হতাশাজনক অবস্থার মধ্যে আটকে ছিল তা হতে তারা বের হয়ে এসেছিল। এই গুণগত পরিবর্তন, যা উম্মাহ্'র মধ্যে এই আশার সঞ্চার করেছিল যেন তারা অধঃপতিত অবস্থা হতে পুনর্জাগরণের চলমান প্রকল্পকে ত্বরান্বিত করে। কারণ, সমাজে পরিবর্তন ও অগ্রগতি আনার পথে অন্যতম বড় বাধাসমূহ হচ্ছে উম্মাহ্'র স্থবিরতা, স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে পরস্পরের মধ্যে আলোচনার অভাব, এবং পরিবর্তনের সম্ভাবনা সম্পর্কে হতাশা। মুসলিম বিশ্বে, বিশেষ করে আরব অঞ্চলে, কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন কারণে এমনটাই ঘটেছে। কারণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল সংস্কার ও পরিবর্তনের প্রচেষ্টার ব্যর্থতা, এবং শাসকগোষ্ঠীর বিরোধিতাকারী কিংবা সমালোচনাকারীদের উপর নিষ্ঠুর দমন-নিপীড়ন। তাই, এটি ছিল একটি ইতিবাচক বাস্তবতা যে, জনগণ রাস্তায় নেমে এসে শাসক ও তার দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, তাকে প্রত্যাখ্যান করে ও নিপীড়ক রাষ্ট্রযন্ত্রসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, এবং 'জনগণ ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর পতন চায়' বলে স্লোগান দেয়। দীর্ঘকাল ঘুমন্ত অবস্থায় থাকা এই উম্মাহ্'র মধ্যে যা ছিল পুনর্জাগরণের একটি লক্ষণ। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন,

قال رسول الله ﷺ: (إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ: إِنَّكَ ظَالِمٌ، فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُمْ). إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ: إِنَّكَ ظَالِمٌ،

"যদি তোমরা দেখ যে আমার উম্মত জালিমকে এটা বলতে ভয় পাচ্ছে যে: 'তুমি জালিম', তাহলে সেই উম্মতের বিদায়"। তিনি (ﷺ) আরও বলেছেন,

وقال ﷺ: (أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر).

"জিহাদের সর্বোত্তম রূপ হল জালিম শাসকের সামনে হক্ব কথা বলা"

অন্যায় সম্পর্কে মানুষের নীরবতা এবং অন্যায়কে প্রত্যাখ্যান করতে অস্বীকৃতি জানানো – এই বিষয়টি সমাজের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থা। অন্যদিকে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ একটি ইতিবাচক ঘটনা ও একটি ভাল লক্ষণ, যা সমাজের কল্যাণের জন্য কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকার দাবিদার। যাইহোক, সমাজগুলো যখন অধঃপতিত অবস্থায় রয়েছে, অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত সংকটে নিমজ্জিত, এবং পাশাপাশি এটি তার আত্মপরিচয় ভুলে গিয়ে, শত্রুর উপর নির্ভরশীল হয়েছে,

এবং যালিম শাসকের শাসনের কাছে নতি স্বীকার করেছে, এমতাবস্থায় সেসকল সমাজের জন্য বিপ্লব কিংবা গণঅভ্যুত্থানকে কেবলমাত্র অন্যায়ের প্রতিবাদ, স্বাধীনতা ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবী, প্রশাসনিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মত দাবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। উম্মাহ্ যে সংকটসমূহের সম্মুখীন হচ্ছে তা কেবল রাজনৈতিক, নিরাপত্তাজনিত অন্যায়-অবিচার এবং প্রশাসনিক দুর্নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর ব্যাপ্তি আরও অনেক বেশি। সুতরাং, পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন আনবে এমন একটি সামগ্রিক রাজনৈতিক প্রকল্প ছাড়া, শুধুমাত্র অন্যায়, দুর্নীতি ও দারিদ্রতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হলে পরিবর্তনের ধরন ও সময়ের প্রেক্ষিতে তা খুবই সীমিত ফলাফল বয়ে আনবে; এমনকি এধরনের গণঅভ্যুত্থান কোন ফলাফল অর্জনের দিকে ধাবিত নাও করতে পারে।

বিপ্লবের পর কিছু কিছু দেশে এমনটাই ঘটেছে।

প্রকৃতপক্ষে, কোনো রাজনৈতিক প্রকল্প ছাড়া অভ্যুত্থানের ফলাফল উল্টো বিপদ ডেকে আনতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে সমাজকে পিছিয়ে দিতে পারে। এটি বিশেষতঃ ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর প্রস্তুতি এবং তাদের পিছনের উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহের তৎপরতার কারণে হয়ে থাকে, যাতে তারা উম্মাহ্'র বিপ্লবকে মোকাবিলা করতে প্রতিবিপ্লবী পদক্ষেপ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আর এই কাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে কাজ করে, সমাজ ও জনমত গঠনকারী ব্যক্তি এবং আন্দোলনের নেতাদের উপর দমন-নিপীড়নের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়া কিংবা তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো। এতে হতাশা ও ভয়ের অনুভূতি নতুনভাবে সঞ্চারের আশঙ্কা তৈরি হয়, এবং পর্যায়ক্রমে পরিবর্তনের প্রকল্প আবারও ব্যাহত হয়। যার ফলস্বরূপ, পরিবর্তনের আরেকটি বসন্ত পেতে বহু বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, যতক্ষণ না হতাশাগ্রস্ত প্রজন্মটির পর নতুন আরেকটি প্রজন্মের আগমন ঘটে।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে: বিপ্লব কি পরিবর্তন আনয়নের একটি পথ? আদৌ কি বিপ্লব কখনো সমাজে পরিবর্তন আনতে পেরেছে?

উত্তর হলো: শুধু অন্যায়, দুর্নীতি বা বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে জেগে ওঠা পরিবর্তনের পথ নয়; আর সেই অর্থে বিপ্লব নিজেই পরিবর্তনের কোন পথ নয়। ইতিহাসে কত বিপ্লবের বিস্ফোরণ ঘটেছে যেগুলো কোন ধরনের পরিবর্তন, কিংবা সীমিত আকারের সংস্কারের দিকেও পরিচালিত করেনি, বরং সম্ভবত কিছু ক্ষেত্রে সমাজকে পিছিয়ে দিয়েছে এবং তার সংকট ও সমস্যা আরও বৃদ্ধি করেছে।

অন্যদিকে, জাতি ও সমাজে বড় পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল বড় বিপ্লবের মাধ্যমে। আসুন, এর প্রমাণ হিসাবে আমরা আধুনিক ও সমসাময়িক বিশ্বের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ দুটি বড় পরিবর্তনের ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করি। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপের সভ্যতাগত রূপান্তর অর্থাৎ সামন্তবাদী এবং চার্চ ও ঐশ্বরিক অধিকারের নামে রাজাদের শাসনের যুগ থেকে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদের যুগে রূপান্তর; এবং রাশিয়াতে গোড়াপত্তন হওয়া কমিউনিস্ট সভ্যতা গড়ার প্রকল্প – যা সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই পতন ঘটেছিল।

পশ্চিমা সমাজে সংঘটিত সভ্যতাগত রূপান্তর এবং শাসনতন্ত্রের গুণগত ও বাস্তবিক পরিবর্তন ছিল ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত বিখ্যাত ফরাসি বিপ্লবের ফসল; এই বিপ্লবটি ছিল পশ্চিমা

সমাজগুলোতে ঘটে যাওয়া একাধিক বিপ্লবের ধারাবাহিকতা, যেগুলোর অনুপ্রেরণা ছিল জনগণের উপর বিদ্যমান অন্যায়, দারিদ্রতা ও নিপীড়ন। অথচ এসব বিপ্লব এমন কোন গুণগত পরিবর্তনের দিকে ধাবিত করেনি, যা অবস্থার পরিবর্তন করে জনগণকে সঙ্কট ও সামাজিক দ্বন্দ্ব থেকে বের করে আনতে পারতো। তথাপিও, বিখ্যাত ফরাসি বিপ্লবের অনুপ্রেরণার কারণসমূহ পূর্বের বিপ্লবগুলোর মতো হলেও এটি নিজেকে সেসব উপাদান দ্বারা সজ্জিত করেছিল যা পূর্বের বিপ্লবগুলোতে অনুপস্থিত ছিল; ফলশ্রুতিতে পরিশেষে এই বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়।

এই বিপ্লব পরিবর্তন ও অগ্রগতির যে মূলমন্ত্র দ্বারা সজ্জিত ছিল সেটা হচ্ছে, সামগ্রিক আদর্শিক চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক প্রকল্প – যার মধ্যে জীবন, সমাজ, ও রাষ্ট্র সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উৎসারিত আইনী ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত আছে। এটি এমন এক প্রকল্পটি ছিল যা সমাজের পরিচয়ে পরিবর্তন আনতে এবং এটিকে জীবনের এক পথ থেকে অন্য পথে, এবং সম্পর্কের এক ব্যবস্থা থেকে অন্য ব্যবস্থায় রূপান্তরে সক্ষম ছিল। এই প্রকল্পটির মধ্যে একই সাথে রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আইনী, এবং আবেগজনিত মাত্রা ছিল; বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপ এবং আলোকিত যুগের দার্শনিকদের মধ্যে চিন্তার মতবিনিময় ও গণসংযোগের ফলাফল ছিল এটি। তাদের চিন্তাগুলো সমাজের মধ্যে ব্যাপক জনমতে পরিণত হয়েছিল, কিংবা বলা যায় কৃষক শ্রেণীর পাশাপাশি অন্ততপক্ষে সমাজের একটি শ্রেণী তথা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপরে এর ব্যাপক প্রভাব ছিল, যাদেরকে তারা বুর্জোয়া বলে অভিহিত করতো।

১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় শুরু হওয়া বিপ্লবের ফলস্বরূপ রাশিয়া যে রূপান্তর প্রত্যক্ষ করেছিল তা দেশটির বিপ্লবী রূপান্তরকে একটি নতুন ব্যবস্থা তথা কমিউনিস্ট ব্যবস্থার দিকে নিয়ে যায়। এই বিপ্লবের আগেও বেশ কয়েকটি বিপ্লব হয়েছিল যেখানে রাশিয়ার জনগণ অন্যায়, দারিদ্রতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিল। তবে, সেই বিপ্লবগুলোর ফলাফল ছিল ব্যর্থতা, কারণ সেগুলোর এমন কোন রাজনৈতিক প্রকল্প ছিল না যা বিপ্লবকে ক্ষমতায় আনতে পারতো। এ অবস্থা চলতে থাকল, যতক্ষণ না কমিউনিস্ট বলশেভিকরা কার্ল মার্ক্সের ধারনাকে আঁকড়ে ধরে ভ্লাদিমির লেনিনের নেতৃত্বে অপ্রতিরোধ্য বিপ্লবের তরঙ্গ চুড়ায় আরোহণের জন্য প্রস্তুত হয় এবং ক্ষমতা দখল করতে পারে। এবং এমন একটি দর্শনের ভিত্তিতে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করতে পারে যা মহাবিশ্ব, মানুষ ও জীবন সম্পর্কে একটি সামগ্রিক আদর্শিক চিন্তা গঠন করে এবং সেখান থেকে একটি জীবন ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। আর এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

এবার আবারও বিগত দশকে আরব অঞ্চলে সংঘটিত বিপ্লবগুলো নিয়ে আলোচনায় ফিরে আসা যাক: কোন বিষয়টি এই বিপ্লবগুলোকে বাস্তবে কোন ধরনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন অর্জনে বাধা দিয়েছে?

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর ধূর্ততা এবং তাদের পেছনের আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ সেইসব বিপ্লবগুলোকে নিষ্ফল করে দেয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছিল, সেটা বিপ্লবীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে হোক কিংবা এক দালাল শাসকের পরিবর্তে অন্য একজনকে প্রতিস্থাপন করে তাদের বিপ্লবকে বাধাগ্রস্ত করেই হোক। আর এর মাধ্যমে তারা এটা দেখিয়ে জনগণের ক্ষোভকে প্রশমিত করতে ও তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয় যে, তাদের বিপ্লব সফল হয়েছে এবং এর ফলে অন্যায় শাসকের পরিবর্তন হয়েছে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে, পশ্চিমা শক্তিসমূহ বিপ্লবের আগে বিদ্যমান শাসনব্যবস্থাটি আবারও ফিরিয়ে আনার আগ পর্যন্ত কিছু সৎ ও আন্তরিক ব্যক্তিদের অস্থায়ী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে কাজ করতে শাসনক্ষমতায় এনেছে; তিউনিসিয়া, মিশর ও লিবিয়াতে এমনটাই ঘটেছে, উদাহরণস্বরূপ: সেখানে এমন লোকেরা ক্ষমতায় এসেছিল যারা দালাল ছিলেন না, কিন্তু তাদের হাতে তেমন কোন রাজনৈতিক প্রকল্পও ছিলনা যেটা দ্বারা তারা দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে পারে। এছাড়া তাদের সম্ভাব্য পরিবর্তন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করার মত তাদের পিছনে কোন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীও ছিল না। আবার কিছু দেশে পশ্চিমা শক্তিসমূহ দমন-নিপীড়ন চালিয়ে, রক্তপাত ঘটিয়ে, এবং অধিবাসীসহ বিভিন্ন শহর ও গ্রাম ধ্বংস করে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের বাড়িঘর থেকে বাস্তুচ্যুত করে বিপ্লব মোকাবিলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল সিরিয়া, যেখানে আজও যুদ্ধ চলছে।

তবে, যে অন্তর্নিহিত দুর্বলতা বেশিরভাগ বিপ্লবকে প্রভাবিত করেছিল এবং তাদের ব্যর্থতার পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিল, সেটা হচ্ছে বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক বাস্তব কোন রাজনৈতিক প্রকল্প উপস্থাপনে ব্যর্থতা, যেটাকে তারা বিদ্যমান শাসনব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে ক্ষমতায় আনতে কাজ করতে পারে। অধিকাংশ বিপ্লবীর লক্ষ্য কেবল "জনগণ ক্ষমতাসীন সরকারের পতন চায়"- এই স্লোগানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের উচ্চাশা ছিল তারা শাসকের পতন ঘটাবে এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য চাপ দেবে। যার মাধ্যমে জনগণ এমন একজন সৎ শাসককে ক্ষমতায় আনবে যিনি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করবেন। তাদের এটা মনে হয়নি সমস্যা আসলে সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত, শুধুমাত্র ব্যক্তি শাসকের মধ্যে নয়। তারা বেমালুম ভুলে গেছেন, দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের প্রকৃত ধারক হচ্ছে বিদেশী উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহ। তাদের এটা মনে হয়নি, পশ্চিমাদের কাছ থেকে সংকেত পেলেই সেনাবাহিনীর কমান্ডারদের মধ্যে যারা দালাল তারা আবার ক্ষমতা দখলের জন্য অগ্রসর হবে।

বিপ্লবীরা মনে করেছিল, আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ দেশের পরিবর্তনকে দূর থেকে শুধু প্রত্যক্ষ করবে এবং তাতে হস্তক্ষেপ করবে না। তারা কল্পনা করেছিল বিপ্লবের পরে তাদের নতুন, প্রতিশ্রুতিশীল রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের সাথে সহাবস্থান করতে পারবে, এবং তারা তাদের দেশের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না এবং তারা তাদের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে সম্মান দেবে। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিল তাদের শাসকগোষ্ঠী পশ্চিমাদের দ্বারা নিয়োগকৃত দালাল। যাদের কাজ হচ্ছে এটা নিশ্চিত করা যাতে ইসলাম শাসনক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন না করে, পশ্চিমা চিন্তাধারা অনুসারে জীবন ও সমাজের সম্পর্কসমূহ গঠিত হয়, পশ্চিমাদের স্বার্থরক্ষা হয় এবং সর্বোপরী এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে যাতে পশ্চিমারা দেশের সম্পদ লুণ্ঠনে সক্ষম হয়।

আশা করা যায় চলমান বিপ্লব পূর্ববর্তী বিপ্লবের ভুলগুলো এড়িয়ে যাবে। অতএব মুসলিম দেশসমূহে বিপ্লবের সাফল্যের জন্য যে উপাদানগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো নিম্নরূপ:

১. ক্ষমতা গ্রহণের সামর্থ্য ও যোগ্যতা আছে এমন একটি রাজনৈতিক দল থাকা আবশ্যক। দলটির যোগ্যতাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো, ইসলামী চিন্তা ও আচরণের সমন্বয়ে গড়ে উঠা ইসলামী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে দলটিকে এমনভাবে গঠিত হতে হবে, যাতে ইসলামী আক্বীদা তাদের আদর্শ, চিন্তাধারা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি হয় – যার আলোকে তারা তাদের রাজনৈতিক মতামত ও অবস্থান তৈরি

করে; যাতে ইসলামী চিন্তাধারা ও বিধি-বিধানই তাদের আচরণ ঠিক করে দেয়, এবং যাতে তাদের রাজনৈতিক চিন্তার ভিত্তিও হয় ইসলাম নিজেই। এই দলটিকে অবশ্যই দেশ ও সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে এবং তা ভালোভাবে মোকাবেলা করতে হবে, এবং বিভিন্ন দেশের পরিকল্পনা, নীতি, চাতুর্য, ষড়যন্ত্র, ও রাজনৈতিক প্রতারণা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যখন রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা নজিরবিহীন পর্যায়ে পৌঁছেছে। অতএব যাদেরকে রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি, অভিজ্ঞতা, এবং প্রজ্ঞা দেয়া হয়েছে কেবল তারাই উদীয়মান রাষ্ট্রকে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে সেগুলোর মোকাবিলা করতে পারবে। এই পথপ্রদর্শক দলটির অস্তিত্ব তখনই থাকতে পারে যখন এটি ইসলামী আক্বীদার ভিত্তিতে একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়, এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী জীবনব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তনই দলটির উদ্দেশ্য হয়।

২. বিপ্লবকে অবশ্যই ইসলামী রাজনৈতিক প্রকল্প দিয়ে সজ্জিত করতে হবে, যে প্রকল্পটি জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য একটি সামগ্রিক আদর্শ-ভিত্তিক চিন্তাধারা এবং একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে গ্রহণের ভিত্তিতে নির্মিত হবে।

অতএব, পরিবর্তনের পথপ্রদর্শকদেরকে অবশ্যই রাষ্ট্রের জন্য একটি ইসলামী সংবিধান আগে থেকেই গ্রহণ করতে হবে, যার মধ্যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র কিতাব এবং তাঁর নবী (সাঃ)-এর সুন্নাহ্ থেকে উদ্ভুত শারী'আহ্ বিধি-বিধানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে কাফির উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহ কর্তৃক আমাদের দেশে আরোপিত মানবসৃষ্ট সংবিধানের পরিবর্তে ইসলামী সংবিধান তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত থাকে।

ইসলামী আইনের সমস্ত বিধি-বিধান সহ এই সংবিধান বাস্তবায়নের বিষয়টি অবশ্যই উল্লিখিত রাজনৈতিক দলের হাতে অর্পণ করা উচিত, কারণ এটাই সেই দল যার সদস্যদের মধ্যে এই প্রকল্প ও ইসলামী ব্যবস্থা সম্পর্কে স্ফটিক স্বচ্ছ জ্ঞান রয়েছে। এটাই সেই দল যারা এই সংবিধান বাস্তবায়নে এবং এর মাধ্যমে জনগণের বিষয়াদির তত্ত্বাবধানে সবচেয়ে সক্ষম। এটাই সেই দল যারা রাজনীতির নিয়মকানুন, এর বাস্তবতা, পদ্ধতি, এবং কৌশল সম্পর্কে সচেতন।

৩. যারা পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে তাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে, কোন সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিবর্তন প্রকল্পই সফল ও কাঙ্খিত ফলাফল বয়ে আনতে পারে না যদি না তা জনমত ও জনপ্রিয় আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে হয়। সমাজের মানুষের পর্যাপ্ত সমর্থন ছাড়া কেবলমাত্র ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে একটি অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা করা হলে তা সফল হবে না। আর, সমাজ ব্যতীত বাস্তবে কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই, যা তার প্রতিনিধিত্ব করে এবং তার ইচ্ছা প্রকাশ করে, কারণ ইসলামী রাজনৈতিক বিধান অনুযায়ী কর্তৃত্ব উম্মাহ্'র।

ইসলাম যে নিছক একটি আধ্যাত্মিক ও আবেগনির্ভর ধর্ম নয়, যা মুসলিমদেরকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শেখানো হয়েছে, বরং এটি যে একটি রাজনৈতিক চিন্তা ও একটি জীবন ব্যবস্থা – এই বিষয়টি সমাজের মানুষকে বোঝানোর মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব পালনের কাজে সমাজকে নিমগ্ন করানোর লক্ষ্যে একটি অসাধারণ প্রচেষ্টা চালানোর গুরুত্ব অপরিসীম। এমন সব চিন্তা ও বিশ্বাস যেগুলো ইসলামের বিরোধিতা করে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য উপযোগী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়

সেগুলোর বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া প্রয়োজন।

সমাজের মানুষের কাছে ইসলামের চিন্তাসমূহ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, কারণ ইসলাম এই চিন্তাসমূহের ভিত্তিতেই তার সম্পর্কসমূহ গঠন করবে, এবং ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ দ্বারাই সকল বিষয়াদি পরিচালনা করবে, যাতে সমাজ একটি ইসলামী সমাজে পরিণত হয়, এবং একটি জীবন ব্যবস্থা, সমাজ ও রাষ্ট্র হিসাবে ইসলাম জনসচেতনতা তৈরীর রূপকার হয়ে উঠে এবং একইভাবে জনমতকেও প্রভাবিত করে। এই জনমত যদি না থাকে তাহলে এমন কোন ভিত্তি থাকবে না যার উপর রাষ্ট্র নির্ভর করতে পারে, যাতে রাষ্ট্র তার প্রতিষ্ঠাকালীন সময় ও পরবর্তীতে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারে।

৪. বিপ্লবীদের অনুধাবন করতে হবে তাদের বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে সেই শক্তির বিরুদ্ধে, দেশের মধ্যে যার সত্যিকারের আধিপত্য বিদ্যমান, আর এই শক্তি হচ্ছে কাফির উপনিবেশবাদী শক্তি। এবং স্থানীয় শাসকেরা উপনিবেশবাদীদের প্রতিনিধি হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনাকারী এবং উপনিবেশবাদীদের প্রকল্প বাস্তবায়নকারী দালাল ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা এর জন্য বোঝা প্রয়োজন যে, ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশের মধ্যে উপনিবেশবাদীদের যে হাতিয়ারগুলো রয়েছে সেগুলো নির্মূল করাই হবে প্রথম কাজ, এবং এই হাতিয়ারগুলো দালালদের একটি বাহিনীর মতো সমাজের সর্বত্র, অর্থাৎ সরকারী বিভিন্ন পদে, প্রশাসনে, শিক্ষায়, মিডিয়ায়, সংবাদমাধ্যমসমূহে, রাজনৈতিক দলগুলোতে, এবং সংস্থাসমূহে বিভিন্ন রূপে ছড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হচ্ছে তারা যাদেরকে সশস্ত্র বাহিনীতে ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোতে স্থাপিত করেছে, এবং এটি আমাদেরকে পরবর্তী ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিকে নজর দিতে বলে।

৫. পরিবর্তনের কাজে নিয়োজিতদের অবশ্যই সশস্ত্র বাহিনীকে মনোযোগের শীর্ষে রাখতে হবে। যাতে তারা বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সুন্দর স্বভাব উভয় দ্বারা সর্বাধিক সংখ্যক সামরিক অফিসারের নিকট পৌঁছানোর জন্য সচেষ্ট থাকে। এর কারণ, এই অফিসারগণই পারে উম্মাহ্'র আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ, উম্মাহ্'র সচেতনতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এবং উম্মাহ্'র আন্দোলনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য প্রস্তুত থাকতে, এবং এমনকি জনগণকে নেতৃত্ব দানের যোগ্যতাসম্পন্নদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য এই আন্দোলনকে সমর্থন জোগাতে। বিপ্লব প্রতিহত করতে এবং পরিবর্তনের পথপ্রদর্শকদের দমন করতে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী সামরিক শক্তি ব্যবহার করতে চাইলে এই ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ সুরক্ষা ভালভ হিসেবে কাজ করতে পারে। বিপ্লবের ইতিহাস প্রমাণ করে, সশস্ত্র বাহিনীতে যদি বিপ্লবীদের কিংবা পরিবর্তনের কাজে নিয়োজিতদের সমর্থন করার মতো পর্যাপ্ত সংখ্যক সমর্থক না থাকে, তবে তারা সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না, যার জন্য তারা তাদের জীবন ব্যয় করেছে। এরকমটি হলে এই সশস্ত্র বাহিনী তাদেরকে দমনের, তাদের ক্ষমতা নির্মূলের এবং দেশের মধ্যে ক্ষমতাসীন সরকার ও তার উপনিবেশবাদী প্রভুদের প্রভাব আরও সুসংহত করার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে।

প্রিয় ভাইয়েরা: পরিবর্তনের এই রাজনৈতিক সংগ্রামের শর্তসমূহ প্রাথমিকভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সিরাত থেকে নেয়া হয়েছে, যাকে (সাঃ) উদাহরণ হিসাবে অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللهَ كَثِيرًا

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ্'র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ, তাদের জন্য যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহ-কে অধিক স্মরণ করে" [সূরা আল-আহযাব : ২১]।

আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিকট দু'আ করি, যেন তিনি আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে কথায় ও কাজে প্রজ্ঞা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন, এবং আমাদের হাতকে সেই পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যান যা তাঁকে এবং তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদেরকে আনন্দিত করে, এবং মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসে।

লেবানন থেকে - আহমাদ আল-কাসাস,
মুখপাত্র, সেন্ট্রাল মিডিয়া অফিস, **হিযবুত তাহ্রীর**

বক্তব্য ০৩: পশ্চিমা দেশসমূহে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের ব্যর্থতা

(অনুবাদকৃত)

পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহের প্রধান দু'টি ভিত্তি স্তম্ভ তথা গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদকে প্রায়শই তাদের সমতা, স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতির জন্য মহিমান্বিত করা হয়ে থাকে। তাত্ত্বিকভাবে, গণতন্ত্রের অর্থ এটা নিশ্চিত করা যে ক্ষমতা "জনগণের" হাতে থাকে, আর পুঁজিবাদকে এমন একটি ব্যবস্থা হিসাবে উপস্থাপন করা হয় যা মুক্তবাজারের মাধ্যমে সুযোগ সৃষ্টির নিশ্চয়তা দেয়। অথচ, যখন আমরা এই ব্যবস্থাসমূহের বাস্তবতা পরীক্ষা করি তখন আমরা দেখতে পাই, সূচনালগ্ন থেকেই এগুলো পদ্ধতিগতভাবে তার আদর্শের সাথে চলতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে এটাকে আসলে ব্যর্থতা না বলে বরং সাফল্য বলতে হবে, কারণ গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ উভয়েরই প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সহিংসতা, যুলুম-অত্যাচার, এবং অসমতা।

গণতন্ত্রের মূলে রয়েছে "জনগণের দ্বারা" সরকারের ধারনা। কিন্তু এই "জনগণ"-এর সংজ্ঞায় ঐতিহাসিকভাবে আদিবাসী, নারী, অখ্রিস্টান, অশ্বেতাঙ্গ, এবং দরিদ্র শ্বেতাঙ্গদের বাদ দেয়া হয়েছে। গণতন্ত্রের সুবিধাভোগীরা সর্বদাই ছিল শ্বেতাঙ্গ, পুরুষ, খ্রিস্টান এবং সম্পত্তির মালিকগণ, আর এই সুবিধা তাদের প্রতিও প্রসারিত করা হয়েছে যারা এই গোষ্ঠীর দ্বারা বৈধতা লাভের জন্য নত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাস বাণিজ্যের অধীনে আফ্রিকান-আমেরিকানদের সস্তা সম্পত্তি ব্যতীত অন্য কোনকিছু হিসেবে বিবেচনা করা হয় নাই – যা ১৮৬৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত করা

হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও এটাকে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রসারিত করা হয়। ১৮৭০ সালের ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে ভোটাধিকারের বিষয়টি জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল পুরুষের প্রতি প্রসারিত করা সত্ত্বেও আফ্রিকান-আমেরিকানদের ভোট দেয়ার অধিকার ১৯৬৫ সালের ভোটাধিকার আইন পাশ হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত করা হয়নি। অস্ট্রেলিয়ায় ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত নারীদেরকে পুরুষদের সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হতো, এবং ১৯০২ সাল পর্যন্ত তাদের নাগরিকত্বের অধিকার দেয়া হয়নি। আদিবাসী অস্ট্রেলিয়ানদেরকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এমনকি মানুষ হিসাবেও স্বীকৃতি দেয়া হয়নি, এর আগে তাদেরকে "উদ্ভিদ ও প্রাণীজগত"-এর অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করা হতো!

এই বর্জন বা বিভাজন কোন দুর্ঘটনা ছিল না। বরং এগুলো ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোর অংশ, যা বাস্তবিকভাবে গুটিকয়েক মানুষকে উপকৃত করেছিল এবং বেশিরভাগকে বাদ দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আদিবাসী ও আফ্রিকান দাসদের বলি দেয়ার মাধ্যমে গণতন্ত্র নির্মিত হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার গণহত্যা, চুরি ও আদিবাসীদের উচ্ছেদের উপর গণতন্ত্র নির্মিত হয়েছিল। উভয় দেশ যেমন উন্নত হয়েছে, তেমনি এই মৌলিক বৈষম্যগুলো কেবল প্রসারিত হয়েছে, যা আজ পর্যন্ত গণতন্ত্রের কুৎসিত বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে যাচ্ছে।

পুঁজিবাদকে প্রায়ই মুক্ত বাজার এবং সমান সুযোগের ব্যবস্থা হিসাবে বর্ণনা করা হয়। তবে যখনই আমরা পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক ভিত্তিসমূহের দিকে তাকাই, তখন আমরা শোষণ, চুরি এবং সহিংসতার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না। অস্ট্রেলিয়ার উপনিবেশবাদের ইতিহাস এরই একটি স্পষ্ট উদাহরণ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ১৭৮৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার উপর তার সার্বভৌমত্ব দাবী করে, এবং টেরা নুলিয়াস (Terra Nullius) মতবাদের মাধ্যমে ভূমির উপর আদিবাসীদের অধিকার খারিজ করে। উল্লেখ্য যে, এটি এমন একটি মতবাদ যা প্রতারণাপূর্ণভাবে অস্ট্রেলিয়ার ভূমিকে "কারো জমি নয়" বলে ঘোষণা করেছিল। এটি আদিবাসীদের জমি পদ্ধতিগতভাবে চুরি ও তাদের বাস্তুচ্যুতিকে বৈধতা দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আদিবাসীদের বাস্তুচ্যুতির নিজস্ব নৃশংস ইতিহাসের মাধ্যমে একই অভিজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করে। উদাহরণ হিসেবে 'ট্রেইল অফ টিয়ার্স'-এর কথা বলা যায়, যেখানে মার্কিন সরকার ১৮৩০-এর দশকে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ৬০,০০০-এরও বেশি আদিবাসী আমেরিকানকে তাদের পূর্বপুরুষদের জমি থেকে জোরপূর্বকভাবে মিসিসিপি নদীর পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চলগুলোতে সরিয়ে নিয়েছিল। এসব বাস্তুচ্যুতি থেকে অর্থনৈতিক লাভের পরিমাণ ছিল অপরিমেয়, কারণ উভয় জাতিই এসব ভূমির উপর ভিত্তি করে তাদের শুরুর দিকের সম্পদ এবং পরবর্তীতে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ তৈরি করেছিল। যার ফলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপর এই অপরিমেয় এবং ধ্বংসাত্মক প্রভাব আজও অব্যাহত রয়েছে।

তাত্ত্বিকভাবে, গণতন্ত্রের উচিত সকল নাগরিকের স্বার্থ ও চাহিদাকে সমানভাবে অগ্রাধিকার দেয়া। অথচ বাস্তবে পুঁজিবাদই গণতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে পুঁজিপতি অভিজাত শ্রেণীর নিছক পুতুলে পরিণত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ২০১০ সালের *'সিটিজেনস ইউনাইটেড'* রায় রাজনৈতিক প্রচারণায় সীমাহীন কর্পোরেট ব্যয়ের অনুমতি দেয়, যা রাজনীতিতে অর্থের প্রভাবকে বাড়িয়ে তোলে। শুধুমাত্র ২০২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল নির্বাচনে ১৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়েছে, যা এটিকে ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল নির্বাচনে পরিণত করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ১% ব্যক্তি দেশের সম্পদের ৪০%

এরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করে, এবং তাদের স্বার্থ গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্তগুলোকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

অস্ট্রেলিয়াকেও একই ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, রাজনীতিতে খনি শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। পরিবেশজনিত ক্ষয়ক্ষতিতে রিও টিন্টো এবং বি.এইচ.পি-এর মতো দানবীয় খনি কোম্পানীগুলোর যথেষ্ট ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও তারা বিপুল পরিমান কর অব্যাহতি এবং সরকারী ভর্তুকি উপভোগ করে থাকে। ২০২১ সালে একটি লোহা আকরিক খনি সম্প্রসারিত করার জন্য রিও টিন্টো জুকান জর্জে ৪৬ হাজার বছরের পুরানো এক আদিবাসী ঐতিহ্যবাহী স্থান ধ্বংস করে – যা ব্যাপক আন্তর্জাতিক ক্ষোভের জন্ম দেয়। অথচ সরকারের পক্ষ থেকে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কার্যকর প্রতিক্রিয়া যৎসামান্যই ছিল।

অস্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশই নব্য-উদারনীতিবাদের মাধ্যমে ব্যক্তিবাদ ও বস্তুবাদের মত সংকীর্ণ পুঁজিবাদী মূল্যবোধসমূহকে আরো মজবুত করেছে এবং জনগণের সামষ্টিক কল্যাণকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। নব্য-উদারনীতিবাদ যেমন, বেসরকারীকরণ, সরকারী বিধিনিষেধ মুক্তকরণ এবং সরকারী ব্যয় সংকোচন ও আয় বৃদ্ধির কঠোরতা নীতি – এগুলোর প্রতিটি সামাজিক বৈষম্য ও বিভক্তি তৈরির জন্য দায়ী। আমরা এমন একটি পৃথিবীতে বসবাস করি যেখানে অর্থনৈতিক উপযোগিতা একসময়ে শুধু বিবেচনা করার মতো একটি বিষয় ছিল, যেটি সময়ের পরিক্রমায় প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং বর্তমানে এটি একমাত্র বিবেচিত বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। যেহেতু সমাজ ক্রমবর্ধমানভাবে বাজার-ভিত্তিক ধারনার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেহেতু এখন একজন ব্যক্তির মূল্য কেবল তার অর্থনৈতিক মূল্য দ্বারা একচেটিয়াভাবে পরিমাপ করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই পরিবর্তনটি সমাজের ক্রমবর্ধমান মেরুকরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে ধনী ১% মানুষ নীচের সারির ৯০% মানুষের চেয়ে অধিক পরিমাণ সম্পদের মালিক। এই পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট যে, সম্পদের মালিকানার এই ব্যবধান নজিরবিহীন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। অন্যদিকে, গৃহহীনতা এবং দারিদ্র্যতা অকল্পনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। অস্ট্রেলিয়ার গল্পও একই রকম। বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ হওয়া সত্ত্বেও গৃহহীনতা ও দারিদ্র্যতা অপ্রতিরোধ্যভাবে বেড়ে চলেছে। শুধুমাত্র সিডনি শহরেই গত পাঁচ বছরে গৃহহীনতার সংখ্যা ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে- এটি একটি স্পষ্ট বার্তা দেয় যে, সার্বিকভাবে সম্পদ বৃদ্ধির চিত্রটি সমাজে তার ন্যায়সঙ্গত বন্টনে প্রতিফলিত হচ্ছে না।

মানুষের সামনে পিকচার পারফেক্ট অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার চকচকে পর্যটক ব্রোশার (ছবি ও তথ্য সম্বলিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা) তুলে ধরা হয়; কিন্তু বাস্তবে পুঁজিবাদী মূল্যবোধসমূহের প্রাধান্যের ফলস্বরূপ ব্যাপক নৈতিক অবক্ষয় তাদের সমগ্র সামাজিক কাঠামোজুড়ে আজ দৃশ্যমান। উভয় দেশেই স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিটি এনগেজমেন্ট কর্মকান্ডে মানুষের অংশগ্রহণ হ্রাস পেয়েছে, অথচ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রবণতাগুলো এমন একটি সমাজের চিত্রকে প্রকাশ করছে যা কেবল আরও খন্ডিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠছে।

গণতন্ত্র, যেমনটি আমরা জানি, মৌলিকভাবে একটি পশ্চিমা উদ্ভাবন, এবং এটিকে উপনিবেশবাদী আগ্রাসনের মাধ্যমে অ-পশ্চিমা সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। গণতন্ত্রের পশ্চিমা ন্যারেটিভ অ-পশ্চিমা জনগণকে এমন অথর্বভাবে উপস্থাপন করে যে, তারা

স্ব-শাসনে অক্ষম কিংবা তাদের পশ্চিমা "সভ্যতার" নির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে বাংলাদেশ সহ অন্যান্য অ-পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ বা আচরণ করে তাতে এই প্রভু-দাস বাস্তবতা আজও টিকে আছে।

গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রচারের ব্যানারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মার্কিন হস্তক্ষেপের ভয়াবহতা আজ সকলের কাছে স্পষ্ট। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ব-ঘোষিত ডেপুটি শেরিফ অস্ট্রেলিয়াও একইভাবে তার উপনিবেশবাদী নীতিসমূহ আধুনিক সময়েও প্রসারিত করেছে। পূর্ব তিমুর থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ চুরিতে এর ভূমিকা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, অস্ট্রেলিয়ান তেল কোম্পানিগুলো সেখান থেকে বিলিয়ন ডলার মূল্যের গ্যাস ও তেল উত্তোলন করেছে, অথচ পূর্ব তিমুর আজও বিশ্বের অন্যতম এক দরিদ্র দেশ হিসেবেই রয়ে গেছে। পাপুয়া নিউগিনি এবং অন্যান্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোতে অস্ট্রেলিয়ার সম্পৃক্ততা নব্য-উপনিবেশবাদী সম্পর্ককেই প্রতিফলিত করে, যেখানে স্থানীয় জনগণের সার্বভৌমত্ব ও কল্যাণকে বলি দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতিকে উপকৃত করার জন্য সম্পদ আহরণ করা হয়।

যদিও পশ্চিমা সমাজের অনেক অন্যায়-অবিচার মোকাবেলা করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন ও রাজনৈতিক সংস্কার করা হয়েছে, তথাপি এই সংস্কারসমূহ প্রায়শই গভীর পদ্ধতিগত সমস্যাসমূহের সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে, যেমন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার আন্দোলন, এবং যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ায় ইরাক ও আফগানিস্তানের যুদ্ধের বিষয়ে জনসাধারণের অনুসন্ধান। তাই মৌলিক প্রশ্নটি থেকেই যায়: বাস্তব দুনিয়ায় এই সংস্কারগুলো কিভাবে কার্যকর হয়? যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভোটাধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতা সম্প্রসারণে উন্নতি করেছে, তথাপি ভোটার দমনের বিভিন্ন কৌশল আফ্রিকান-আমেরিকান এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোকে অসমভাবে প্রভাবিত করে চলেছে, এবং আমেরিকার বর্ণবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহ কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ এবং কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের উপর তাদের সহিংস হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাজ্যে মিথ্যা পূর্বানুমানের ভিত্তিতে বৃটেন কর্তৃক ইরাক যুদ্ধে যোগদান করার সিদ্ধান্তের বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য তিনটি পৃথক তদন্ত শুরু করা হয়। ২০০৩ সালের 'দ্য হাটন ইনকোয়ারি', ২০০৪ সালের 'দ্য বাটলার রিভিউ', এবং ২০১৬ সালের 'চিলকট' তদন্তের প্রতিটিতে বিপর্যয়মূলক গোয়েন্দা ব্যর্থতা, সরকারী ব্যর্থতা এবং নেতৃত্বের ব্যর্থতার মতো বিষয়সমূহ সামনে আসে। প্রতিটি পয়েন্টে ফৌজদারি অপরাধ তদন্তের ধারনাটি স্পষ্টভাবে অনুপস্থিত ছিল, দোষ-ত্রুটি নিয়মিত অগ্রাহ্য করা হতো, এবং এক মিলিয়নেরও বেশি জীবন ধ্বংসকারী এই বিপর্যয়ের জন্য শেষ পর্যন্ত কাউকে দায়ী করা হয়নি।

অস্ট্রেলিয়ায়, আফগানিস্তানে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের বিষয়ে ২০১৭ সালের স্বাধীন তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর এর বিরুদ্ধে ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার দুটি প্রধান মিডিয়া সংস্থার একটি মানহানির মামলা ঘিরে ব্যাপক হৈচৈপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রতিবেদনে উত্থাপিত অভিযোগ অনুযায়ী আফগানিস্তান সংঘাতের সময় অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ চৌকশ সৈনিক বেন রবার্টস-স্মিথ আদৌ যুদ্ধাপরাধ করেছে কিনা তা কেন্দ্র করেই ছিল এই শোরগোল। তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন সত্য বলে প্রমাণিত হয়, এবং মানহানির মামলা খারিজ করে দেয়া হয়। কিন্তু দশকব্যাপী চলা এই দীর্ঘ তদন্তকালীন সময়ে, যেখানে এটি স্বীকার করা হয়েছিল যে যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে, অস্ট্রেলিয়ান

প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের আচরণ কিংবা আফগানিস্তান যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কোন রাজনৈতিক বা সামরিক নেতার অপরাধমূলক দোষের তদন্ত করা হয়নি। অস্ট্রেলিয়া আবারও সকল দোষ-ত্রুটি ও অপরাধ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে, যেমনটা সবসময় করে থাকে।

এই কারণেই পশ্চিমা নেতাদের যথার্থই স্যুট-বুট পরিহিত অত্যাচারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা নিজেদেরকে সভ্যতা ও আইনের শাসনের আলোকবর্তিকা হিসাবে উপস্থাপন করে, এবং জনসাধারণের জবাবদিহিতা নিশ্চিতের নামে প্রতারণামূলক জনঅনুসন্ধানের আয়োজন করে। পশ্চিমা দেশসমূহের অপরাধের প্রকৃত বাস্তবতাকে আড়াল করে তৃতীয় বিশ্বের কথিত বর্বরতা থেকে নিজেদেরকে ভিন্ন হিসেবে প্রমাণের জন্যই তারা এসব করে থাকে।

কিন্তু এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে ... গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ কিভাবে এতটা খারাপ হতে পারে, যেহেতু অনেক দিক থেকেই পশ্চিমের অবস্থা প্রাচ্যের অবস্থার তুলনায় অনেক ভালো? এর উত্তরটি আশ্চর্যজনকভাবে সহজ। আমাদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারনার মধ্যে পার্থক্য করতে হবে: উদ্দেশ্যগতভাবে খারাপ এবং তুলনামূলকভাবে ভাল। উদ্দেশ্যগতভাবে খারাপ তার নিজস্ব কারণে খারাপ। কিন্তু উদ্দেশ্যগতভাবে খারাপকেও ভালো হিসেবে দেখানো যেতে পারে যদি সেটাকে আরও খারাপ কোন কিছুর সাথে তুলনা হয়। এরপরেও সেটা খারাপ, তবে সেটাকে আর আগের মতো বেশি খারাপ বলে মনে হবে না। পশ্চিমা সমাজে যা আছে তা উদ্দেশ্যগতভাবে খারাপ, কিন্তু অনেক অ-পশ্চিমা সমাজে যা আছে তার সাথে তুলনা করলে সেটাকে তাৎক্ষণিক তুলনামূলকভাবে ভাল মনে হবে।

কিন্তু এখানে আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপলব্ধি করা প্রয়োজন। গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ শুধু কোন একটি দেশের অভ্যন্তরেই শ্রেণীগত পার্থক্য সৃষ্টি করেনি বরং বিভিন্ন দেশের মধ্যেও শ্রেণীগত পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকায় বর্তমানে ২ মিলিয়ন মানুষ কারাগারে রয়েছে, ৪০ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে, প্রায় ১ মিলিয়ন মানুষ গৃহহীন, ১০০ মিলিয়নের চিকিৎসা ঋণ রয়েছে এবং ৪০ মিলিয়ন নিয়মিত মানসিক রোগের ওষুধ সেবন করে। উপরন্তু, শীর্ষ ১০% মানুষ মোট সম্পদের ৭০%-এর মালিক, যেখানে নীচের সারির ৫০% মোট সম্পদের মাত্র ২%-এর মালিক। এটিকে পৃথিবীর স্বর্গ বলে অভিহিত করা খুব কমই যথার্থ হবে।

কিন্তু বিষয়টি এখনো রয়ে গেছে ... এসব সত্ত্বেও, আমেরিকাকে এখনও পৃথিবীর বেশিরভাগ জায়গার চেয়ে তুলনামূলকভাবে ভাল মনে হচ্ছে। সুতরাং, প্রশ্ন থেকে যায়, কেন? এর উত্তর হল শ্রেণীগত বিভেদ। আমেরিকা সম্পদ, জাতি, লিঙ্গ, এবং ধর্মের মতো বহু সারিতে বিভক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পদের বৈষম্য উল্লেখযোগ্য, তবে শ্বেতাঙ্গদের সাথে শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় না বরং শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে এই বৈষম্য বেশী স্পষ্ট। বর্ণবাদ এমন একটি সমস্যা যা কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়কে দুর্বল করে শ্বেতাঙ্গদের নয়। নারীরা পুরুষদের তুলনায় বেশি কষ্ট ভোগ করেন এবং খ্রিস্টানদের তুলনায় মুসলিমরা বেশি বৈষম্যের শিকার হয়। আমেরিকায় জীবন ভীতিকর, এটি অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দরিদ্র, কালো ও বাদামী, এবং অ-খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে। আমেরিকা সম্পর্কে আমরা যে 'ভালো' কল্পনা করি তার অনেকটাই ধনী, শ্বেতাঙ্গ, এবং খ্রিস্টানদের অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত। আমেরিকার জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা সার্বজনীন

নয়, এবং এটি আপনার ক্ষতি করে নাকি উপকার করে তা মূলত আপনি যে গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত তার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

এই শ্রেণীগত পার্থক্যসমূহ কেবল তাদের দেশের অভ্যন্তরেই নয়, বরং বিভিন্ন দেশের মধ্যেও প্রযোজ্য। আমেরিকার মধ্যে জনগণকে বিভক্তকারী এই একই বৈষম্য আমেরিকার বাইরের দেশগুলোকেও বিভক্ত করেছে। একারণেই পশ্চিমা দেশগুলোকে বেশিরভাগ অ-পশ্চিমা দেশগুলোর তুলনায় বেশী সম্পদ ভোগকারী। সাদা দেশগুলো কালো ও বাদামী দেশগুলোর চেয়ে বেশী সম্পদ ভোগকারী। খ্রিস্টান দেশগুলো অ-খ্রিস্টান দেশগুলোর তুলনায় বেশী সম্পদ ভোগকারী। কারণ, বর্তমান পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থা অনুযায়ী কালো, বাদামি ও মুসলিম মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই! এই কারণেই ইরাকে মিলিয়ন মানুষ মারা যায় আর বিশ্ব এমনভাবে চলতে থাকে যেন কিছুই ঘটেনি; কিংবা সমগ্র ফিলিস্তিন ধ্বংস যাচ্ছে আর পুরো বিশ্ব নীরবে তাকিয়ে আছে; কিংবা যুদ্ধ ও সংঘাত আফ্রিকাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে কিন্তু এটি সংবাদ মাধ্যমগুলোতে স্থান পর্যন্তও পায় না! এবং আমেরিকার বিপরীতে, শুধু একটি দেশের মানুষই তার নিজদেশে পরাধীন নয়, বরং সমগ্র দেশগুলোই আজ পরাধীন। সুতরাং, পশ্চিমা দেশগুলো তাদের অল্প কিছু নাগরিকের সাথে ভাল এবং অন্যদের সাথে খারাপ আচরণ করে, এবং তারা অ-পশ্চিমা দেশগুলোর সমস্ত নাগরিকের সাথে উদ্দেশ্যমূলকভাবে খারাপ আচরণ করে। সমস্ত নেতিবাচকতা সত্ত্বেও এই কারণেই মাঝে মাঝে মনে হয়, পশ্চিমা দেশগুলোর জীবন এখনও অ-পশ্চিমা দেশগুলোর তুলনায় ভালো। কিন্তু এটি একটি মিথ্যা তুলনা, এবং এই তুলনামূলক চিন্তার কারণেই অনেকে পশ্চিমকে দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক উভয় বৈষম্যের জন্য চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়।

গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ ঐতিহাসিকভাবে সহিংসতা, চুরি ও শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত গভীর ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা। এর ট্র্যাজেডিগুলো কেবল ইতিহাসের বইগুলোতেই লিপিবদ্ধ নয়, বরং প্রাচ্য ও পশ্চিমে অতিবাহিত হওয়া প্রতিটি দিন ও ক্ষণে সেগুলো চলমান আছে। আমাদের অবশ্যই প্রশ্ন করা উচিত: এব্যবস্থাগুলোর নানাবিধ ব্যর্থতা অনুধাবনের পরও কিভাবে আমরা এই ব্যবস্থাগুলোর প্রতি আমাদের আবেদন অব্যাহত রাখছি, যা ঐতিহাসিকভাবে এতটা ঘৃণ্য, প্রয়োগ এতটা বর্জনীয়, এবং অ-পশ্চিমা দেশগুলোতে এর বাস্তবায়ন এতটা সহিংস!

আমরা যদি আরও ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত সমাজ গড়তে চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই এই ব্যর্থতাগুলোর মুখোমুখি হতে হবে এবং ব্যর্থতাগুলোর পেছনে দায়ী ব্যবস্থাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

অস্ট্রেলিয়া থেকে - ওয়াসিম দউরি
সদস্য, **হিযবুত তাহ্‌রীর**

বক্তব্য ০৪: রাষ্ট্রের সামগ্রিক পরিবর্তন দ্রুত বাস্তবায়নের রোডম্যাপ

ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী ব্যর্থ হচ্ছে, আর আমাদের দেশেও ব্যর্থ হয়েছে। তাই এই ব্যবস্থাকে সংস্কারের নামে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, *"প্রকৃত মু'মিন একই গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয় না"* (সহীহ্ বুখারী)। তাই আমাদেরকে রাষ্ট্রের সামগ্রিক পরিবর্তন করতে হবে অর্থাৎ ইসলামী ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান এই রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কীভাবে সামগ্রিক পরিবর্তন বাস্তবায়িত হবে? কেউ কেউ এই ধারনা পোষণ করেন, বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অপসারণ করে ইসলামী ব্যবস্থা তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, বরং বর্তমান ব্যবস্থায় তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান ব্যবস্থাকে সামগ্রিক পরিবর্তন করে তাৎক্ষণিক ইসলামী ব্যবস্থা বাস্তবায়ন সম্ভব। এই পর্যায়ে আমরা "সামগ্রিক পরিবর্তন দ্রুত বাস্তবায়নের রোডম্যাপ" উপস্থাপন করছি:

- খিলাফত রাষ্ট্রে সংবিধান নিয়ে কোন বিতর্ক থাকবে না। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, রাষ্ট্র পরিচালনায় **হিযবুত তাহ্রীর** কুর'আন-সুন্নাহ্ এর ভিত্তিতে **"খিলাফত রাষ্ট্রের সংবিধান (খসড়া)"** প্রণয়ন করেছে। এই সংবিধান কীভাবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করবে, জনগণের জীবনমান উন্নয়ন করবে এবং একটি নেতৃত্বশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে সে বিষয়গুলো **হিযবুত তাহ্রীর** বিভিন্ন সময়ে জনগণের সামনে উপস্থাপন করেছে। আর জনগণও এই বিষয়ে একমত। এই সংবিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় **হিযবুত তাহ্রীর** সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

- সংবিধানের পাশাপাশি একটি রাষ্ট্রের জন্য দরকার যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হবেন খলিফা – যিনি হবেন ন্যায়পরায়ণ। আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্রের খলিফা হবেন **হিযবুত তাহ্রীর**-এর আমীর আতা বিন-খলিল আবু আর-রাশতা, যিনি প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ এবং মুজতাহিদ। তিনি হবেন আমিরুল মু'মিনীন, অর্থাৎ নির্যাতিত ফিলিস্তিন-কাশ্মিরসহ সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের অভিভাবক। ইন্দোনেশিয়া থেকে মরোক্ক পর্যন্ত প্রত্যেকটি মুসলিম তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, *"যে ব্যক্তি (খলিফার) আনুগত্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নিল, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্'র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার জন্য কোন প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি (খলিফার হাতে) বাই'আত না দিয়ে মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল"* (সহীহ্ মুসলিম)। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রে **হিযবুত তাহ্রীর** খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে সংগঠিত করে আসছে এবং রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এবং তরুণ সমাজসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণের মধ্যে এই দল এবং খিলাফতের পক্ষে ব্যাপক সমর্থন রয়েছে। বাংলাদেশে খিলাফতের গোড়াপত্তন হলে খলিফাকে কেন্দ্র করে **হিযবুত তাহ্রীর**-এর নেতৃত্বে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ বিশ্বের সর্ববৃহৎ ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হবে। আর প্রথম দিন থেকেই এই রাষ্ট্র বিশ্বে একটি প্রভাবশালী ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হবে। সুতরাং, আমেরিকা-বৃটেন-ভারতের মত

রাষ্ট্রসমূহ এই রাষ্ট্রের উপর হস্তক্ষেপ করার সাহস পাবে না।

- খলিফার মেয়াদকাল সুনির্দিষ্ট নয়। তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত খলিফা থাকবেন যতক্ষণ তিনি শারী'আহ্ বিধি-বিধান মেনে চলবেন। যদি তিনি খলিফা পদে অধিষ্ঠিত থাকার যোগ্যতা হারান, তাহলে তৎক্ষণাৎ কাজী আল কুজ্জাত খলিফাকে অপসারণ করবেন। যেহেতু খলিফার আইন পরিবর্তন করার কোন ক্ষমতা নাই সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই খিলাফত রাষ্ট্রে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

- শাসনব্যবস্থা হবে কেন্দ্রীয় এবং প্রশাসন হবে বিকেন্দ্রীক। খলিফা বাংলাদেশের জন্য একজন ওয়ালী (গভর্ণর) নিয়োগ দিবেন যিনি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনা করবেন এবং খলিফার নিকট জবাবদিহি করবেন। বর্তমান সচিবগণের মধ্যে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যারা সৎ ও দক্ষ তারা ওয়ালী বা গভর্ণরের অধীনে প্রশাসনিক সহকারী হিসেবে কাজ করবেন এবং তারা সরাসরি ওয়ালীর নিকট জবাবদিহি করবেন।

- বাংলাদেশের ওয়ালী শাসনকার্যকে বিকেন্দ্রীকরণ করে আটটি বিভাগে আটজন আ'মিল নিয়োগ দিবেন যিনি হবেন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শাসক। সৎ ও দক্ষ জেলা প্রশাসকগণ উক্ত আমিলের অধীনে প্রশাসনিক সহকারীর দায়িত্ব পালন করবেন এবং তাদের কাজের জন্য আমিলের নিকট জবাবদিহি করবেন। আ'মিল যেহেতু একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের শাসক তিনি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করবেন।

- খলিফা ন্যায়পরায়ণ ও ইসলামী আইন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ একজন মুজতাহিদ-কে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিবেন। উক্ত প্রধান বিচারপতি অন্যান্য বিচারপতি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ দিবেন। রাষ্ট্রে তিন ধরনের বিচারক থাকবেন: কাজী আল খুসুমাত - যিনি জনগণের মাঝে লেনদেন ও শাস্তি সংক্রান্ত বিষয় মীমাংসা করবেন; কাজী আল হিসবা (মুহতাসিব) - যিনি জনগণের অধিকার সংক্রান্ত আইনভঙ্গের বিচার করবেন; কাজী আল মুহকামাত আল মাজালিম - যিনি জনগণ ও শাসনব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করবেন। আর প্রধান বিচারপতি প্রশাসনিক নিয়মের মধ্যে থেকে যেকোন বিচারককে নিয়োগ প্রদান, বরখাস্ত কিংবা তাকে নিয়মানুবর্তী করতে পারবেন। ফলে বিচারবিভাগ নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীন হবে।

- বর্তমান বিচারপতিদের মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণ তাদেরকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে এবং তারা শারী'আহ্ আইন দিয়ে বিচার-ফয়সালা করবেন। তাদের 'Science of Jurisprudence' এর উপর যে অভিজ্ঞতা রয়েছে সে অভিজ্ঞতা ইসলামী সংবিধান বাস্তবায়নের কাজে আসবে। তাদেরকে ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ইসলামী সংবিধানের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। আর অমুসলিমদের পারিবারিক বিষয়াদি, যেমন, বিবাহ-বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরসূরীর মধ্যে সম্পদ বন্টনসহ ধর্মীয় বিষয়সমূহ ফায়সালা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ধর্মের বিচারকদের সমন্বয়ে বিশেষ আদালত গঠন করা হবে যারা তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী বিবাদ মীমাংসা করবেন।

- কাজী আল মুহকামাত আল মাজালিম (Court of Injustice Acts) নিরবচ্ছিন্নভাবে খলিফাসহ রাষ্ট্রের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার করবেন।

খলিফার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আদালতে বিচারাধীন থাকলে খলিফার হাতে প্রধান বিচারপতিকে বরখাস্ত করার অধিকার থাকবে না। বরং খলিফা যদি এমন অপরাধ করেন যার মাধ্যমে তিনি শাসন করার যোগ্যতা হারান তখন প্রধান বিচারপতি খলিফা-কে বরখাস্ত করার ক্ষমতা রাখেন। ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর-প্রভাবশালী ও পদস্থ কর্মকর্তাদের দুর্নীতি করার পথ বন্ধ হবে এবং সমাজ থেকে দুর্নীতির চিরতরে অবসান ঘটবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, *"হে লোক সকল! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ ধ্বংস হয়েছে এই কারণে যে, তাদের মধ্যে যখন কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত; আর যদি কোন দূর্বল লোক চুরি করত, তবে তারা তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করতো। আল্লাহ্'র কসম! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও যদি চুরি করতো, তবে নিশ্চয়ই আমি তার হাত কেটে দিতাম"* (সহীহ্ মুসলিম)। ফলে খিলাফত রাষ্ট্রে তথাকথিত 'স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন' এর প্রয়োজন নাই।

- খিলাফত রাষ্ট্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো মজলিস আল-উম্মাহ্। খলিফা মজলিস আল-উম্মাহ্ (Council of Ummah) গঠন করার লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করবেন, যাদের মধ্যে নারীসহ সকল ধর্মের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। তবে তারা বর্তমান সংসদ সদস্যদের মত আইনপ্রণেতা হবেন না, বরং তারা সর্বদা খলিফাকে পরামর্শ দিবেন ও জবাবদিহি করবেন। এছাড়া তাদের নির্বাচনী এলাকা এবং সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির প্রয়োজন ও অধিকারসমূহ খলিফার নিকট উপস্থাপন করবেন। খলিফার পদ শূন্য হলে তারা খলিফা নির্বাচিত করবেন।

- তিন বাহিনী (সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী) এবং সামরিক পুলিশ কেন্দ্রীয়ভাবে খলিফার অধীনে থাকবেন। খলিফা হবেন সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক (Commander-in-Chief)। আর পুলিশ বাহিনী ওয়ালী এবং আ'মিলের অধীনে থাকবে যারা রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বজায় রাখা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা তত্ত্বাবধান এবং আইন প্রয়োগ করার কাজে নিয়োজিত থাকবে। যেহেতু পুলিশ বাহিনীর উপর কোন রাজনৈতিক প্রভাব থাকবে না, তারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে জনগণের জান ও মাল রক্ষা এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

- সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব গঠন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হবে, এবং উচ্চশিক্ষাকে সময়োপযোগী ও বৈশ্বিক মানের করা হবে। একটি সুনির্দিষ্ট কারিকুলামের মাধ্যমে পাঠদান করা হবে এবং সিলেবাসে ইসলামী আক্বীদার সাথে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় থাকবে না। মাধ্যমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত কো-এডুকেশন বিলুপ্ত হবে। এক্ষেত্রে, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মর্নিং-শিফ্‌ট এবং ডে-শিফ্‌ট চালুর মাধ্যমে নারী-পুরুষ আলাদা করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

- অনেকে অপপ্রচার করে, খিলাফতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে অমুসলিমদের কোন স্থান নাই। প্রকৃতপক্ষে, শাসকের পদ [যেমন: খলিফা, মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ (প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী), ওয়ালী (গভর্ণর), আ'মিল (মেয়র)], ইত্যাদি পদ ছাড়া সকল প্রশাসনিক পদে যোগ্য অমুসলিমগণ চাকুরী করতে পারবেন। এই অঞ্চলে মুসলিমদের শাসনকালে মোহনলাল সহ বহু অমুসলিম সেনাপতির নাম ইতিহাসে লিখিত আছে।

সর্বোপরী, রাষ্ট্রের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তার নাগরিকদের মাঝে শাসন, বিচার-ফয়সালা এবং বিভিন্ন বিষয়াদির ব্যবস্থাপনায় কিংবা এধরনের অন্যান্য বিষয়ে কোন প্রকার বৈষম্য করা। বরং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের প্রতি সমান আচরণ করতে হবে।

প্রিয় দেশবাসী, বর্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামো সামগ্রিক পরিবর্তন করে খিলাফত ব্যবস্থায় পরিণত করা জটিল কোন বিষয় নয়। অনেকে একটি অপপ্রচার করে দেশের জনগণ ইসলামী শাসনের জন্য প্রস্তুত নয়। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ সেন্টারের বরাত দিয়ে যুক্তরাজ্যের সংবাদ মাধ্যম ইনডিপেনডেন্ট দাবি করেছে, মুসলিমদের মধ্যে ৮২ শতাংশই শারী'আহ্ আইনের পক্ষে। দেশে ধর্ম পালনকারী মুসলিমদের মধ্যে ৮৮ শতাংশ এমন আইন চায়। অপরদিকে, ধর্ম পালনে নিয়মিত নয় এমন ৭৯ শতাংশ ব্যক্তিও শারী'আহ্ আইনের পক্ষে। আপনারা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করেছেন, খ্যাতনামা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণরা কালেমার পতাকা হাতে নিয়ে র‍্যালির মাধ্যমে ইসলামী শাসনের প্রতি তাদের আবেগকে জানান দিয়েছে। তাদের এই র‍্যালি দেশী-বিদেশী গণমাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহ্ এখন শুধুমাত্র একজন সাদ ইবনে মু'য়াজের মত সামরিক অফিসারের প্রতীক্ষায় রয়েছে, যিনি নবুয়তের আদলে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্রীর**-কে নুসরাহ্ (ক্ষমতা) প্রদান করবেন।

"সেদিন মু'মিনরা আনন্দিত হবে; সে বিজয়ে যা অর্জিত হবে আল্লাহ্'র সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি পরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু" [সূরা আর-রুম : ৪-৫]।

বক্তব্যটি উপস্থাপন করেন - জনাব আবু সাঈদ
সদস্য, **হিযবুত তাহ্রীর**

উপসংহার:

প্রিয় দেশবাসী! যুলুম এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার বিপ্লব এখনো চলমান আছে, কারণ এই ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সংস্কার করে এই যুলুম এবং বৈষম্যের অবসান হবে না। একমাত্র নবুয়তের আদলে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হবে, ইনশা'আল্লাহ্। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, *"...অতপর যুলুমের শাসনের অবসান হবে; তারপর আবারও ফিরে আসবে খিলাফত – নবুয়তের আদলে"* (হাদিস: মুসনাদে আহমদ)। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই হাদিসের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে এই যুলুম ও বৈষম্যের অবসান এবং খিলাফত রাষ্ট্রের প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ আমাদেরকে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুসংবাদ হচ্ছে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র প্রতিশ্রুতি। আপনারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করছেন, আল্লাহ্'র ইচ্ছায় **হিযবুত তাহ্রীর**-এর নেতৃত্বে খিলাফত প্রতিষ্ঠা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"(এটি) আল্লাহ্'র প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না"** [সূরা আর-রুম : ০৬]

যোগাযোগঃ

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্‌ বাংলাদেশ

www.ht-bangladesh.info
contact.hizb.tahrir.bd@gmail.com
WhatsApp: +880 1306 414 789

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র